৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা মে ২০১৫ ● আই.এস.এস.এন. ঃ ২২৭৮-৭৪৪৫

কাল থেকে কালাতীতের যাত্রালিপি

সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক

নিরন্তর

স্পেশাল ৩০১-এর লাঠ্যৌষধ

জনস্বাস্থ্য ও কর্পোরেট চিকিৎসা

কালের দর্পণে কর্পোরেট চিকিৎসা

কর্পোরেট চিকিৎসার খন্ড চিত্রাবলী

কর্পোরেট হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসকরাও

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকল্প কি কর্পোরেট

এবং

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

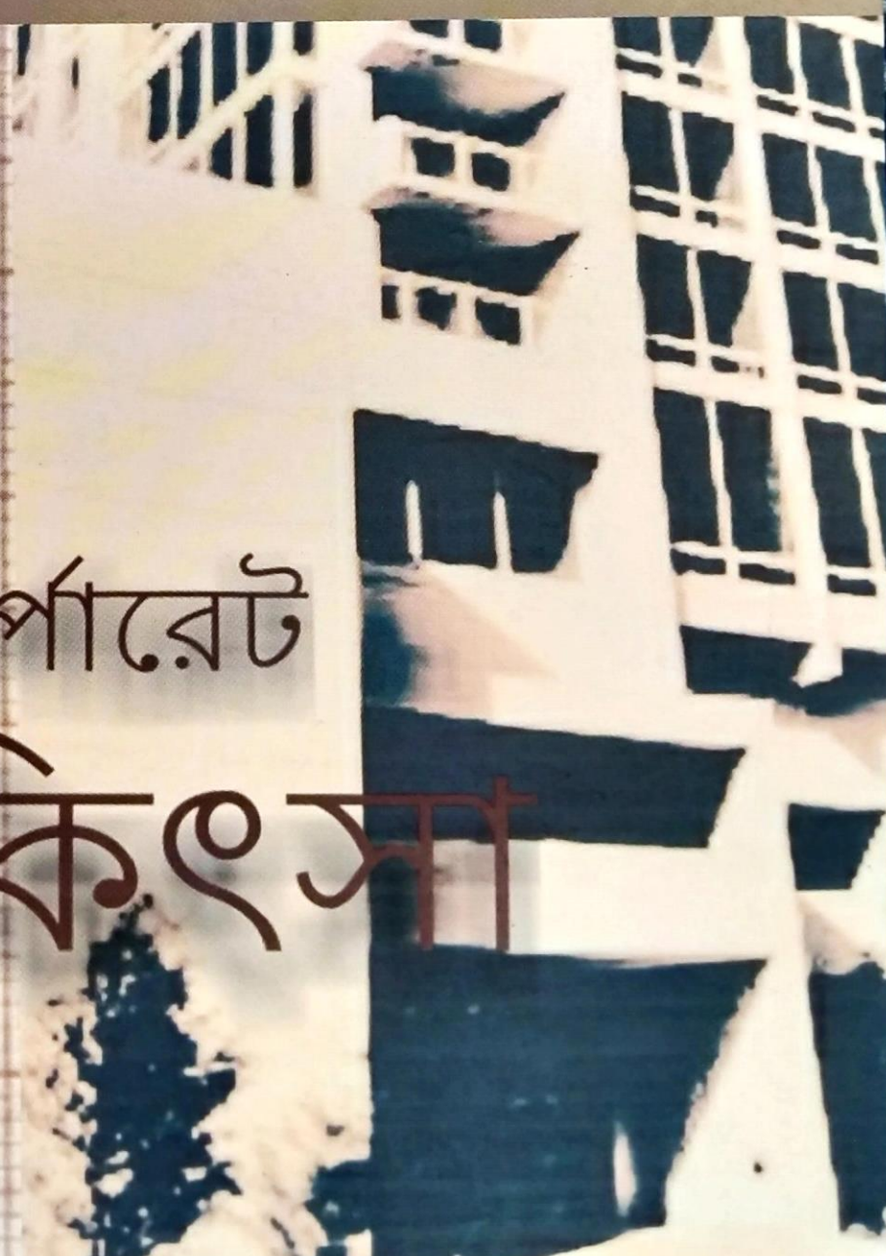

কর্পোরেট চিকিৎসা

সৌজন্য সংখ্যা

নিরন্তর

কাল থেকে কালাতীতের যাত্রালিপি
সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক
৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা মে ২০১৫ ISSN 2278-7445

আমাদের কথা (সম্পাদক) ৩

কর্পোরেট চিকিৎসা

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকল্প কি কর্পোরেট? : ডা: স্থবির দাশগুপ্ত ৬

কালের দর্পণে কর্পোরেট চিকিৎসা : ডা: পান্নালাল ভুঁইয়া ১২

কর্পোরেট হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসকরাও : ডা: পূণ্যব্রত গুণ ১৯

স্পেশাল ৩০১-এর লাঠ্যৌষধ : ডা: আশিস দত্ত ২৩

কর্পোরেট চিকিৎসার খণ্ড চিত্রাবলী: ডা: সুকান্তি ভট্টাচার্য ২৮

জনস্বাস্থ্য ও কর্পোরেট চিকিৎসা : ডা: সুমন রায় ৩১

কবিতা ৩৫-৪০

সমরেশ মুখোপাধ্যায় • প্রবাল মুখোপাধ্যায় • শমিত মণ্ডল • সন্তোষ মুখোপাধ্যায় • শুভদীপ দত্তচৌধুরী • মৃণাল ঘোষ • সরোজ দরবার • জগন্ময় মজুমদার • কৌস্তভ রায় • তন্ময় দাস • অভিষেক গঙ্গোপাধ্যায় • বাপ্পাদিত্য মুখোপাধ্যায় • তিস্তা • শুভদীপ বিশ্বাস • টোকন মান্না • দেবাশিস সাহা •

গুচ্ছ কবিতা ৪১-৪৪

দীপ্তি প্রকাশ দে • প্রবীর মণ্ডল • উত্তরণ চৌধুরী • পিনাকী ঘোষ •

বাংলাদেশের কবিতা ৪৫-৪৬

আবু দায়েন • মামুন রশীদ • আলী প্রয়াস • মাহমুদ টোকন • মাসুদুজ্জামান •

বাংলা কবিতা-ফিরে দেখা ৪৭

প্রবন্ধ

৪৯ **ধর্মীয় মৌলবাদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড :** মাহমুদ টোকন

৫৪ **কবিতায় বাংলাদেশের নব্বই দশক :** মাসুদুজ্জামান

ছোটলেখা

৬১ **মন কেমনের রঙ :** তটিনী দত্ত

৬২ **গভীরে গোপনে :** মাসুম মাহমুদ

৬৩ **শীত-ফুরোনো হাওয়া :** শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প

৬৬ **যোগ বিয়োগ :** শতদল দেব

৬৯ **তালাক :** পরভীন সুলতানা

৭৩ **মীরণের ছুরি :** বিশ্বজিৎ কর্মকার

বিশেষ রচনা

৭৭ **ডানার স্বভাবে :** চন্দন চৌধুরী

৭৯ **ঠাঁই নেই :** গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

৮২ **অশ্রুরঞ্জনের গল্প :** রাজীব কুমার ঘোষ

অনুবাদ

৮৪ **অক্টাভিও পাজ্-এর কবিতা :** পিনাকী ঘোষ

সাম্প্রতিকী

৮৬ **'আচ্ছে দিন আয়েঙ্গে' :** সবুজ মুখোপাধ্যায়

৮৯ **কোরপান শা হত্যা :** পান্নালাল ভুঁইয়া

৯০ **মাথা নিচু রাণাঘাটে :** রাহুল ঘোষ

গ্রন্থ ভাবনা

৯১ **কিছু সরল সুন্দরের কাছে :** সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

৯২ **অন্তরের সন্ত্রাস ও একলা বাতিঘর :** বিধান সাহা

৯৩ **যেন অসংখ্য স্বভাবের স্বরলিপি :** প্রশান্ত সরকার

৯৪ **ভাবনার সাথে ভাব করা :** বিশ্বজিৎ কর্মকার

৯৫ স্মরণ : গুন্টার গ্রাস

৯৬ পাঠকের কলম

চিত্র সূচি

অমিত চক্রবর্তী ২২ শিবপ্রসাদ পাল ৬০ নিয়াজ মাকদুম ৭৬

সম্পাদক : গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী : আশিস দত্ত, পান্নালাল ভুঁইয়া, শিবপ্রসাদ পাল, ইমনকল্যাণ জানা

প্রকাশক : তটিনী দত্ত, **প্রচ্ছদ :** পিনাকী ঘোষ

বর্ণস্থাপন ও মুদ্রণ : করুণাপ্রেস, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

দপ্তর: ১) বি-৪/২৮৬, পো: কল্যাণী, **জেলা:** নদীয়া, **পিন:** ৭৪১২৩৫, **দূরভাষ:** ৯১৬৩২০৮২৪১
২) ডি-৫৮, নিউ গড়িয়া হাউসিং কর্পোরেশন, কলকাতা-৯৪, দূরভাষ: ৯১৬৩৩০০৯১৩
ইমেল: nirantar.kalyani@gmail.com ওয়েবসাইট: www.e-nirantor.com

কর্পোরেট হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসকরাও

ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ

আজ থেকে বছর ৩০-৩৫ আগে আমরা যখন মেডিক্যাল ছাত্র, জুনিয়ার ডাক্তার, কলকাতায় বড় প্রাইভেট হাসপাতাল বা নার্সিং হোম বলতে বোঝাতে দুটোকে — উডল্যান্ড'স আর বেল ভিউ। ছোটখাট কিছু নার্সিং হোম ছিল কোনো কোনো পাড়ায় মূলত ডাক্তাররা যার মালিক। সবচেয়ে ভালো পরিষেবা পাওয়া যেত সরকারি হাসপাতালে, প্রধানত মেডিকাল কলেজগুলোতে —পরিকাঠামোও ভাল, ভাল চিকিৎসকবাহিনী। অসুস্থ হলে রাজ্যের মন্ত্রী-নেতারা নাসিং হোমে ভর্তি না হয়ে ভর্তি হতেন মেডিকাল কলেজে। মেডিকাল কলেজের পরিকাঠামো এতোটাই ভাল ছিল যে, চিকিৎসকরা কখনও লুকিয়ে চুরিয়ে হাসপাতালের যন্ত্র নিয়ে যেতেন নার্সিং হোমে অপারেশন করতে।

না, স্বাস্থ্য তখন দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার ছিল না, ছিল কেবল নির্দেশক নীতিতেই। কিন্তু কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণায় তখন দেশনায়করা চেষ্টা করতেন কল্যাণকর কিছু পদক্ষেপ নিতে — স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, কৃষি, এমন সব পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতেই। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে মজবুত করে গড়ে তোলার প্রয়াস, হাতি কমিটির যুগান্তকারী রিপোর্ট, ওষুধের মূল্যনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা সেই সময়েই হওয়া।

অবস্থাটা বদলাতে থাকে নব্বই-এর দশকের গোড়া থেকে যখন দেশের সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার আর বিশ্ব ব্যাংক থেকে বড় পরিমাণে ঋণ নিতে থাকে এবং ঋণের শর্ত হিসেবে পরিষেবা ক্ষেত্রগুলো থেকে সরে আসতে থাকে, স্বাস্থ্যকে ব্যবসায়ীদের মৃগয়াক্ষেত্র করে তুলতে থাকে। সরকারী হাসপাতালে ইউজার ফি অর্থাৎ, ব্যবহারকারী দেয় অর্থ নেওয়া শুরু হয়, পরিকাঠামোর পেছনে খরচ কম করা হতে থাকে, অন্যদিকে বেসরকারী হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য কমদামে জমি, করছাড় দেওয়া শুরু হয়। যে পরিষেবাগুলো আগে সরকার বিনামূল্যে রোগীদের দিত, সেগুলো ছেড়ে দেওয়া হতে থাকে বেসরকারী স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের হাতে প্রাইভেট-পাব্লিক-পার্টনারশিপ মডেলে। চিকিৎসকের অভাব পূরণের জন্য নতুন সরকারী মেডিক্যাল কলেজ না খুলে বেসরকারী মেডিকাল কলেজ খোলায় উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে, মুনাফাই যে কলেজগুলো খোলার মূল উদ্দেশ্য। আমাদের রাজ্যের মতো কোনো কোনো রাজ্যে শিক্ষক-চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিষিদ্ধ করে তাঁদের তুলে দেওয়া হয় বেসরকারী হাসপাতালগুলোর হাতে।

আমাদের দেশের অবস্থাটা এখন এরকম:

সরকার জিডিপি-র ১.০৪% খরচ করে স্বাস্থ্যখাতে। স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচের তা ৩০% -এরও কম। অন্যদিকে গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে সে দেশের সরকার খরচ করে জিডিপির ৯%। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভে ৩-এর তথ্য অনুযায়ী দেশের প্রায় ৮০% আউটডোর চিকিৎসা ও ৬০% ভর্তি থেকে চিকিৎসা আজ হয় প্রাইভেট চিকিৎসা ক্ষেত্রে। দেশের মানুষ যাঁদের কাছ থেকে বেসরকারী চিকিৎসা পরিষেবা নেন, তাঁদের মধ্যে ৪০% প্রশিক্ষণহীন গ্রামীণ চিকিৎসক। দেশে প্রায় ১১ লক্ষ ২৫ হাজার রেজিস্টার্ড ডাক্তার, তাঁদের মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার সরকারী চাকরীতে আছেন — বাকীরা হয় প্রাইভেট প্র্যাকটিস নাহলে কর্পোরেট হাসপাতালে কাজ করেন। সরকারী চাকরী নেই এমনটা কিন্তু নয় — ৭৬% সরকারী ডাক্তারের পদ খালি পড়ে রয়েছে। প্রশিক্ষিত চিকিৎসকদের ৫৯% শহরে কেন্দ্রীভূত। যদিও জনসংখ্যার ৭৫% গ্রামবাসী, তবু ৮৪% হাসপাতাল-শয্যা শহরে। পকেট থেকে চিকিৎসার খরচ প্রতি বছর ৬ কোটি ৩০ লক্ষ দেশবাসীকে দারিদ্রসীমার নীচে নামিয়ে দেয়।

দেশবাসীর ৮০% আউটডোর চিকিৎসা ও ৬০% ইনডোর চিকিৎসা যোগান দেয় যে বেসরকারী হাসপাতালগুলো, বিশেষ করে কর্পোরেট হাসপাতালগুলো, তারা কিভাবে মানুষকে শোষণ করে, কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত তারা — তা নিয়ে পুণের 'সাপোর্ট ফর অ্যাডভোকেসি অ্যাণ্ড ট্রেনিং টু হেলথ ইনিশিয়োটিভ (SATHI) একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল, দেশের ৭৮ জন চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেই সাক্ষাৎকারগুলো প্রথমে সংকলিত হয় 'কৈফিয়ৎ' নামে এক মারাঠী বইয়ে। সম্প্রতি ইংরেজী সংস্করণ বেরোলো 'ভয়েসেস অফ দ্য কনসেন্স ফ্রম দ্য মেডিক্যাল প্রফেশন' নামে। চিকিৎসায় দুর্নীতির কথা নতুন কিছু নয়, কিন্তু এতোদিন আমরা তা শুনে এসেছি ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে, এবার মুখ খুলেছেন বিবেকবান ক'জন ডাক্তার। বেসরকারি হাসপাতলের অনিয়ম, ওষুধ কোম্পানীগুলোর প্রভাব, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পণ্য করে তোলার পিছনে কর্পোরেট হাসপাতালগুলোর প্রভাব এবং এই সমস্যার সমাধানের পথ — এমন সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে বইটিতে।

যে ৭৮ জন চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাঁদের 'র‍্যাশনাল' বা যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসক বলা যায়। এঁদের মধ্যে ৬৬

জন প্রাইভেট প্র্যাকটিসনার, মেডিকাল কলেজ বা সরকারি হাসপাতলে যুক্ত ৭ জন, বাকি ৫ জন অলাভজনক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। এঁদের মধ্যে ৩৭ জন নিজের নামেই বইটাতে আছেন, বাকী ৪১ জন নিজের নামে সাক্ষাৎকার দিতে পারেননি নানান চাপের কারণে। দেখা যাক কী বলছেন তাঁরা।

প্রথম পরিচ্ছেদ মুম্বইয়ের সিনিয়র ডায়াবেটিসবিদ বিজয় অজগাওস্করের সাক্ষাৎকার। প্রথমেই তিনি বলেছেন, "একজন ডাক্তারের কাজ মানুষের সেবা করা"। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও স্বীকার করতে হয় যে, চিকিৎসকের পেশা আর পাঁচটা পেশার মতো নয়। অন্য কোন পেশাই ডাক্তারের পেশার মতো মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে কাজ করে না। তিনি বলেছেন, "আমরা ব্যক্তি মানুষের চিকিৎসা করি না। করি ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, এক্স-রে এমআরআই-এর মতো কিছু সংখ্যার চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ পর্বে আমাদের মানুষের দেহ কাটাছেঁড়া করতে শেখানো হয়, ব্যক্তি মানুষ হিসাবে তাকে সামগ্রিক চিকিৎসা করতে নয়।"

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, একজন কমবয়সী রোগীকে, যাঁকে জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে, তাঁকে জীবনদায়ী ব্যবস্থায় রাখা উচিত, কিন্তু কেন একজন বৃদ্ধকে, যাঁর বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনাই নেই, তাঁকে কেন ওই ব্যবস্থায় রাখা হবে, যার মোট ফল পরিবারের নিঃস্ব হয়ে যাওয়া।

আজগাওঙ্করের এই প্রশ্ন, অভিজ্ঞতার উদাহরণ রয়েছে বইটার পাতায় পাতায়। রোগীকে প্রথমেই একগাদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো বা একগাদা ওষুধ গেলানো দিয়ে ব্যবসা শুরু হয় বেসরকারি হাসপাতলে। একটি ছোট শহরের চিকিৎসক জানিয়েছেন, কোনও ভাইরাল জ্বরে প্লেটলেট কাউন্ট কমলে, তিনি তেমন রোগীদের আলাদা করে নিয়মিত রক্তপরীক্ষা করান, কিন্তু এধরনের রোগীদের ভর্তি করানোর দরকার নেই। অথচ তাঁর শহরের বেসরকারি হাসপাতালে প্লেটলেট কাউন্ট কমলেই রোগীকে ভয় দেখিয়ে ভর্তি করানো হয়, স্রেফ স্যালাইন দেওয়ার জন্য, রোগীর পয়সাকড়ি আছে বুঝলেই তাঁকে সোজা আইসিউতে পাঠানো হয়।

বড় শহরের আরেক চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, হার্ণিয়া অপারেশনের কোনও প্রয়োজন না থাকলেও বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে অনেকের অপারেশন করানো হয়, চামড়ায় কতগুলো স্টিচ করে মোটা টাকার বিল ধরানো হয়। মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলির চিকিৎসক সুভাষ পাটিল যা বলেছেন, তা আমাদের অপরিচিত নয়। রাত দুটোয় কোনও রোগীকে নিয়ে তার পরিজনেরা যখন হিমশিম, নির্দিষ্ট হাসপাতালে যেতে চাইছেন, রিকশ বা অটোচালক জানাচ্ছেন, তেমন হাসপাতল আছে বলে তাঁদের জানা নেই! তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্য হাসপাতালে, যেখানে চিকিৎসক বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 'কাট মানি'র বন্দোবস্ত রয়েছে।

কাট মানি ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার কাছ থেকে নেন চিকিৎসকেরা। সরাসরি টাকা উপহার এমনকী বিদেশযাত্রার মাধ্যমে। প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর কাছ থেকে নেয় বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সরকারি হাসপাতলে সরকারের নজর কমছে, পিপিপি মডেলে বিভিন্ন পরিষেবা সুলভে দেওয়ার নামে বেসরকারি সংস্থাকে ঢোকানো হচ্ছে, ফলে রোগীর পকেটে টান পড়ছে। সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামো উন্নত না হয়ে অবনতি হওয়ায় বেসরকারি হাসপাতাল হয়ে যাচ্ছে ভগবান, সেখানে ঢুকলে ঘটিবাটি বিক্রি হওয়ার উপক্রম। এই বইয়ে সেগুলোকে বলা হয়েছে 'হাসপাতাল মল'!

আর যে চিকিৎসকেরা দিনের পর দিন এগুলো করে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের মানসিকতা কীরকম?

ছত্তিশগড়ের শহীদ হাসপতালের ডা. জানা বলেছেন, মেডিক্যাল ছাত্র পাস করে বেরনোর পরেই ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার শিকার হয়ে ওঠে, বলা ভাল নিজেদের হতে দেয়। এই সব সংস্থার কাছ থেকে উপহার নেওয়া যে আদর্শবিরোধী, সে বিষয়ে তাদের ভ্রুক্ষেপই নেই। বরং উপহার পাওয়াটাকে অধিকার বলে মনে করে। এই উপহার নেওয়া, সুবিধা নেওয়া, রোগীকে শুষে নেওয়ার মানসিকতার সঙ্গে বেসরকারি মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্র তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে। বর্তমানে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বেসরকারি মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে জোর দিচ্ছে। কিন্তু এমন প্রতিষ্ঠানে ফি কত? লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ডাক্তারী পড়ার পর সেই টাকা উশুল করে নেওয়ার মানসিকতা কাজ করছে নতুন চিকিৎসকদের একাংশের মধ্যে।

ক্লিনিকাল ডায়াগনসিসের বদলে গুচ্ছের পরীক্ষা এবং যন্ত্রনির্ভরতা (ডায়গনসিসের ক্ষমতার অভাব, তজ্জনিত শিক্ষার অভাব, রোগী মারা গেলে মামলার ভয় বা ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা এবং বাণিজ্যিক হাসপাতলের টার্গেট পূরণের চাহিদার চাপ — সব ধরণের কারণেই) বাড়ছে। ফলে রোগ নির্ণয়ের নামে রোগীর পকেট কাটা যাচ্ছে।

এতো গেল নতুন-চিকিৎসকদের কথা। যাঁরা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত সেই সব চিকিৎসকদের একাংশের মানসিকতা বুঝিয়েছেন একটি বড় শহরের সার্জন। তাঁরা একটি সম্মেলন করবেন বলে স্থির করেন, এ-ও ঠিক করেন, কোনও ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার বদান্যতা নেবেন না, তাই থাকা-খাওয়ার খরচ তুলতে চিকিৎসকেরাই একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ১২০০ অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকের মধ্যে মাত্র ২০০ জনের ব্যবস্থা উদ্যোক্তাদের করতে হয়েছে, বাকিদের সব খরচই দিয়েছে ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা। ওই সার্জনের মন্তব্য, "ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে কী দোষ দেব? ওরা তো আমাদের কিনে নিয়েছে, ন্যূনতম আদর্শ, নৈতিকতাও কারও মধ্যে নেই।"

চিকিৎসকেরা নিজেরাই জানিয়েছেন, ক্লিনিকাল ডায়াগনসিসের বদলে গুচ্ছের পরীক্ষা এবং যন্ত্রনির্ভরতা (ডায়গনসিসের ক্ষমতার অভাব, তজ্জনিত শিক্ষার অভাব, রোগী মারা গেলে মামলার ভয় বা ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা এবং বাণিজ্যিক হাসপাতলের টার্গেট পূরণের চাহিদার চাপ — সব ধরণের কারণেই) বাড়ছে। ফলে রোগ নির্ণয়ের নামে রোগীর পকেট কাটা যাচ্ছে। রোগ থাকছে সেই তিমিরেই।

স্বাস্থ্যপরিষেবা বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে মূলত যে দুই দানবকে চিহ্নিত করা হয়েছে এই বইয়ে, তার একটি ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা, অন্যটি কর্পোরেট বা বেসরকারি হাসপাতালের বাণিজ্যচক্র।

কলকাতার চিকিৎসক জয়ন্ত দাশ জানিয়েছেন, ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার নতুন কৌশলের কথা। তিনি জানাচ্ছেন, ১ টাকারও কম দামের অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল ডক্সিসিলিন এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। ওষুধপ্রস্তুতকারী সংস্থা ডক্সিসিলিনের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ল্যাক্টোব্যাসিলাস মিশিয়ে যে ক্যাপসুল বাজারে এনেছে তার দাম পাঁচ টাকা। ফলে চিকিৎসকেরা অনেকসময় সেগুলিই দিতে বাধ্য হন।

যত বেশিসংখ্যক রোগী ভর্তি করানো, তাঁদের উপর যতসম্ভব বেশি পরীক্ষা করা, এমনকী, অস্ত্রোপচার করানো যে 'টার্গেট' চিকিৎসকদের উপর থাকে, তার উদাহরণ দিয়েছেন কলকাতার চিকিৎসক পার্থপ্রতিম পাল। তিনি জানিয়েছেন, ইসিজিতে কিছু অনিয়ম ধরা পড়ায় একজন রোগী শহরের নামকরা এক কার্ডিওলজিস্টের কাছে যান। তিনি প্রথমে ইকো-কার্ডিওগ্রাম করেন, তারপর অ্যাঞ্জিওগ্রাম করেন এবং অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে হবে বলে জানান। ওই ব্যক্তি তখন পার্থবাবুর কাছে এলে তিনি ইসিজি করেন এবং দেখেন যে ওই ব্যক্তির কোনও সমস্যা নেই।

সমস্যার কথা আমরা কমবেশি সকলে জানি, উত্তরটা কী?

স্বাস্থ্যপরিষেবার বাণিজ্যিকীকরণের থেকে মুক্তি কোথায়? বেশ কয়েকজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা (ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার) চালু করার কথা। ব্রিটেনে বা শ্রীলঙ্কা সহ বিশ্বের ৪০ শতাংশ দেশে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যেখানে সরকার জনগণের দেওয়া করের টাকা থেকে জনগণের চিকিৎসার খরচ বহন করে। হাসপাতালে রোগীকে সরাসরি টাকা দিতে হয় না। সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করলেও সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়। বেসরকারি হাসপাতালগুলোর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা মজবুত করার কথা বলেছেন অনেকে। সামাজিক আন্দোলন বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কথাও বলেছেন অনেকে।

কিন্তু করে কে? কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে বহু মানুষের মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে এই নজরদারি ব্যবস্থার অভাব দেখিয়ে দিয়েছিল, টাকা নেওয়ার কলের তলায় রোগী সুরক্ষার অন্ধকার দিকটিও দেখিয়েছিল। অথচ রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন সেই হাসপাতাল চালু করার অনুমতি না দেওয়ায় শিল্পসংস্থা রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পারে, এমন কথাও সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল, এই হাসপাতাল খুলতে না দেওয়া যে সরকারের শিল্পবিরোধী নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয়, তা-ও বলা হয়েছিল। ফলে আমাদের সামাজিক মনোভাবও বোঝা দরকার।

এ সব কিছু নিয়েই ভেবে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে এই বইটি। স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভুক্তভোগী হয়েও যারা গুমরে মরি, তাঁদের কাছে অন্তত এই আশ্বাসটুকু বইটি দিতে পেরেছে, পাল্টা আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে চিকিৎসকদের মধ্যে থেকেও। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। একজোট হয়ে অন্তত চিকিৎসকেরাই তো বলতে শুরু করছেন, চলছে না, চলবে না।

এই বইয়ে কলকাতার কার্ডিওলজিস্ট গৌতম মিস্ত্রি জানিয়েছেন, সরকারি হাসপাতালে তাঁকে জ্বরজারি সারানোর কাজেই মূলত ব্যবহার করা হতো। বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি যান একটি কর্পোরেট হাসপাতালে। সেখানে রোগীকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দিন হাসপাতালে রাখার চাপ, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানোর চাপ, অস্ত্রোপচার করানোর চাপ নেবেন না বলে সেটাও ছাড়েন। গত কয়েক বছর ধরে তিনি কনসালট্যান্ট। রোগীর হৃদযন্ত্রের শুশ্রুষা করেন, তাকে ভাল রাখার চেষ্টা করেন, যাতে রোগীকে হাসপাতালে যেতে না হয়, অকারণ অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি আর বাইপাসের খপ্পরে পড়তে না হয়।

স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিপরীতে এই মানুষগুলোর লড়াই-ই এই বই, পরবর্তী আন্দোলনের ভিত্তিও। ■